জীবনঘাতি মিনিকেট চাল

চাল স্বচ্ছ ও ঝকঝকে করতে মেশানো হচ্ছে বিষাক্ত রাসায়নিক আর সরু করতে ছেঁটে ফেলা হচ্ছে আবরণ। এতে পুষ্টিগুণ হারাচ্ছে প্রধান এই খাদ্য শস্যটি। বেশি লাভের আশায় এবং মোটা চালকে মিনিকেট নামে চালিয়ে দিতে অসাধু পন্থা অনুসরণ করছে অনেক চালকল মালিক। অথচ মিনিকেট নামে কোন ধান নাই পৃথিবীতে।

মেশিনের এক প্রান্তে ঢেলে দেয়া হয় সাধারন মোটা চাল আর অপর প্রান্তে বের হচ্ছে জীবনঘাতী চাল মিনিকেট। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হতে অনুমোদন নিয়ে প্রকাশ্যে কারখানা স্থাপন করে ভিতরে চালাচ্ছে একেবারেই জীবনধ্বংসী অনৈতিক কাজ কঠোর গোপনীয়তায়।

পরিদর্শনে দেখা গেছে, ব্রি ২৮, ২৯, ৩৯ বা ব্রি ৫০ জাতের মোটা ধানের খোসা ছাড়িয়ে প্রথমে মেশানো হয় ডিটারজেন্ট বা উচ্চ মাত্রার খার। এতে চাল নরম হয়ে আসে, সুবিধা হয় চাল ছেঁটে ফেলতে। তারপর রং সাদা করতে ব্যবহার হয় ইউরিয়া সার। সবশেষে মোম পালিশের নামে আবার মেশানো হয় রাসায়নিক।

পুষ্টি বিজ্ঞানীগণ বলছেন ইউরিয়া আর খার মিশে যাওয়ায় বিষ ঢুকছে মানব শরীরে। আবরণ ছেঁটে ফেলায় চালে থাকছে না কোন খনিজ আর ভিটামিন। এই ধরনের রিফাইন কার্বহাইড্রেড খেলে শুধু মাটা হবে আর শরীরে বাসা বাঁধবে অনেক অনেক রোগ।

বাজারে যেখানে মোটা চাল বিক্রি হচ্ছে ২৮ থেকে ৩৫ টাকায়। সেখানে মিনিকেট চাল বিক্রি হচ্ছে ৫৫ থেকে ৬৫ টাকায়। অনেক লাভের লোভেই জীবনঘাতী মিনিকেট চাল বানাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অনেক হিংস্র ব্যবসায়ী।

হতে পারে একটি খবর

শত শত বছর আগে ইউরোপসহ অনেক দেশের মানুষ আমাদের দেশে এসেছিল খাদ্যের সন্ধানে অথচ আমরাই এখন আমাদের মাটি, পানি, বাতাস ধ্বংস করে তাদের পায়ের জুতা এবং গায়ের জামা বানাচ্ছি।

আমরা শুরু থেকেই অর্গানিক ছিলাম। আমাদের গোলাভরা ধান ছিল, গোয়ালভরা গরু ছিল, পুকুর ভরা মাছ ছিল। এদেশে ১ টাকায় ৮ মন চাল পাওয়া যেত, ইতিহাস তার স্বাক্ষী। আমাদের সম্পদের প্রাচুর্য্যতা দেখে অনেক দেশের মানুষের অন্তর্জালা শুরু হয় এবং আমাদেরকে ধ্বংসের পথ খুজতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তারা স্বার্থক। ৭০ এর দশকে কিছু বহুজাতিক কোম্পানীর প্ররোচনায় এবং আমাদের তথাকথিত কিছু কৃষি বিজ্ঞানীর ব্যাক্তিগত স্বাথের্র কারণে ক্ষতিকারক রাসায়নিক সার ও কীটনাশক এদেশে আসা শুরু হয়, এর পর কৃষিতে একের পর এক বিপর্যয় আসতে থাকে। ফলে আমাদের মাটি বিষাক্ত হয়ে গেছে, উৎপাদিত হচ্ছে বিষাক্ত ফসল, খাচ্ছি বিষাক্ত খাদ্য, দূষিত হচ্ছে আমাদের পরিবেশ এবং দেহের রক্ত।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও জানা জরুরী যে মানবদেহের প্রতি গ্রাম রক্তে ০.২ মা: গ্রাম বিষ সহনীয় হলেও আমরা বহন করছি ৯.৭ মা:গ্রাম। এ কারণে প্রতি বছর নিস্পাপ শিশুসহ প্রায় ২ লাখ মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে। দেশের অর্ধেকেরও বেশী মানুষ হৃদরোগ, লিভাররোগ, কিডনীরোগ, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত। প্রতিদিন হাসপাতাল, ক্লিনিকের সংখ্যা বাড়ছে। চিকিৎসাবাবদ সরকার এবং জনগণের কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে।

নিরাপদ কৃষি, নিরাপদ খাদ্য ও সুস্থ্য জীবন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০১০ সালে ইধহমষধফবংয ঙৎমধহরপ চৎড়ফঁপঃং গধহঁভধপঃঁৎবৎং অংংড়পরধঃরড়হ নামীয় একটি বানিজ্য সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠনের মূল উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে -

০১। পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ কৃষি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠায় কাজ করা, সহযোগিতা দেয়া
০২। প্রতি উপজেলায় ১টি জৈবসার কারখানা এবং প্রতি জেলায় ১টি জৈব কীটনাশক কারখানা প্রতিষ্ঠায়

সহযোগিতা দেয়া।

০৩। কৃষকগণকে জৈব কৃষি / ঙৎমধহরপ অমৎরপঁষঃঁৎব পুনরুদ্ধারে উৎসাহিত এবং প্রশিক্ষণ দেয়া

০৪। প্রতি উপজেলায় ১টি করে প্রকৃত কৃষি-ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা দেয়া

০৫। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সারাদেশে একাধিক ল্যাবরেটরী স্থাপনে সরকারকে সম্মত করা

০৬। সদস্যগণকে তাদের উৎপাদিত অর্গানিক পণ্য রপ্তানীকরণে সহযোগিতা দেয়া

০৭। দেশী জাতের সকল ফসলের বীজ পুনরুদ্ধার, সীডব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং পুনরায় চাষে উৎসাহিত করা

০৮। গবাদিপশু পুণরুদ্ধার এবং পালনের সুফল সম্পর্কে কৃষক এবং দেশের মানুষকে জাগিয়ে তোলা।

০৯। রাসায়নিক সার ও রাসায়নিক কীটনাশকের কুফল বিষয়ে দেশের মানুষকে অবহিত করা।

আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যই কৃষিতে জৈব প্রযুক্তি এবং ব্যবস্থাপনা অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর এটি প্রতিষ্ঠা পেলে -

ক) ১৫-২০ শতাংশ ফলন বেশী হবে এবং কৃষকের উৎপাদন খরচ কমবে

খ) খাল বিল নদী নালায় মাছ ফিরে আসবে

গ) ৩০% শতাংশ বৈশ্বিক উষ্ণতা কমবে

ঘ) মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে এবং পুষ্টিমান ফসল উৎপাদিত হবে

ঙ) পরিবেশে জীব বৈচিত্র ফিরে আসবে এবং উদ্ভিদের প্রজনন ক্ষমতা ফিরে আসবে

চ) গ্রামের মানুষের ব্যপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে

ছ) প্রচুর পরিমানে বৈদেশিক মূদ্রা আসবে

জ) মানুষের রোগব্যধি কম হবে এবং চিকিৎসার অর্থ সাশ্রয় হবে

ঝ) কৃষক, প্রক্রিয়াজাতকারী, আমদানিকারক এবং রপ্তানীকারকের মধ্যে সু-সম্পর্ক স্থাপিত হবে প্রভৃতি।

জাতিসংঘের মতে -

"Only Organic Agriculture can establish Food Security" FAO: Rome 03/05/2007

"Organic Agriculture will Feed the World very soon" – International Research finds

"Organic agriculture can be more conducive to food security" UNEP, UNCTAD

অর্গানিক পণ্য রপ্তানী ঃ ২০১৮ সালে গ্লোবাল মার্কেটে প্রায় ৮০০ বিলিয়ন মাঃ ডলারের অর্গানিক পণ্য বিক্রয় হচ্ছে। এর মধ্যে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতই প্রায় ১০০ বিলিয়ন মাঃ ডলারের অর্গানিক পণ্য রপ্তানী করছে। আমরাও বছরে কমপক্ষে ২০০ মিলিয়ন মাঃ ডলারের অর্গানিক পণ্য রপ্তানী করতে পারি।

পুনরায় শুরু হলো উত্তম বিকল্প খাদ্য এবং মহৌষধ ঢেমশির চাষ

ঢেমশি ক্ষেত

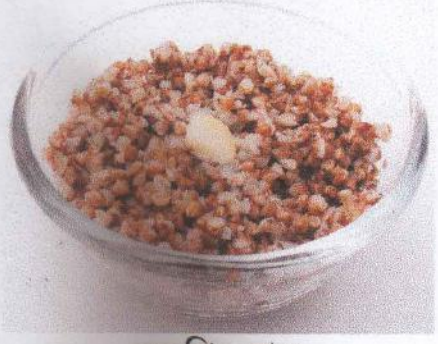

ঢেমশির ভাত

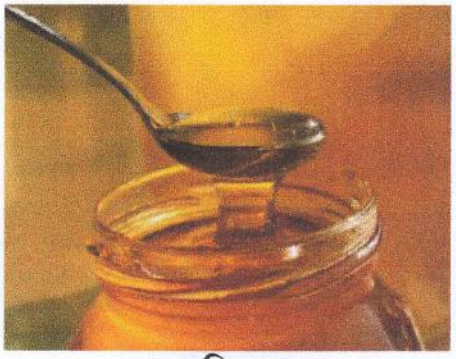

ঢেমশির মধু

ঢেমশি, যার ইংলিশ নাম বাকহুইট। পৃথিবীর ১০টি সেরা খাদ্যের মধ্যে অন্যতম একটি। অথচ আমাদের দেশে এটি সবচেয়ে অবহেলিত ফসল ছিল। মজার বিষয় যে, উন্নত দেশগুলোতে ঢেমশি খায় জ্ঞানী এবং বড়লোকরা আর আমাদের দেশে খেতো সবচেয়ে গরীব এবং অশিক্ষিতরা। এটি ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, হাঁড়ক্ষয়রোগ এবং মেয়েলী রোগের একটি মহৌষধও বটে।

৯০ এর দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এ ফসলটি আমাদের দেশের বিভিন্ন জেলায় চাষ হতো। পরিতাপের বিষয় যে, সংশ্লিষ্ট এবং জ্ঞানপাপীদের অজ্ঞতার কারণে মহাপোকারী এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ ফসলটি হারিয়ে গেছে এবং প্রতিস্থাপিত হয়েছে জীবন ধ্বংসকারী যতসব আজে-বাজে ফসল এবং আখাদ্য-কুখাদ্য। তবে বাংলাদেশ অর্গানিক প্রোডাক্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ ফসলটি পুনরুদ্ধারে চেষ্টা করছে এবং পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী জেলায় ইতোমধ্যে চাষ শুরু করেছে।

এটি একটি অলৌকিক ফসল যাতে রয়েছে মানবদেহের জন্য অতি-জরুরী অনেক পুষ্টি উপাদান। এতে রয়েছে ভাত, রুটি, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, সব্জি এবং ফলের প্রায় সকল পুষ্টি উপাদান, সে সাথে রয়েছে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন, মিনারেল, এ্যামাইনো এসিড এবং ইলেক্ট্রোলাইট। এ ফসলটি চাষ করতে কোন সার, পানি, কীটনাশক এবং যত্ন লাগে না। অথচ, ১কেজি বোরো / হাইব্রীড ধান ফলাতে শুধু পানিই লাগে প্রায় ৫ হাজার লিটার। আর এ কারণেই বাংলাদেশের মাটির নিচের পানির স্থর অনেক নিচে নেমে গেছে এবং যাচ্ছে। অপরদিকে বোরো / হাইব্রীড ধান ফলাতে গিয়ে লাখ লাখ টন ক্ষতিকারক রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে মাটি, পানি, বাতাস এবং জনস্বাস্থ্যের বারোটা বাজিয়েছি। আর এ কারণেই পুকুর, খাল-বীল, নদী-নালায় মাছ নাই। জীব-বৈচিত্র প্রায় হারিয়ে গেছে। লাখ লাখ মানুষ ক্যান্সারসহ বিভিন্ন জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত। তাই, জীবন এবং পরিবেশ বাঁচাতে অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও খুব শিঘ্রই বোরো / হাইব্রীড ধান চাষ বন্ধ করে অধিক পরিমাণে ঢেমশি চাষ জরুরী।

ঢেমশি ঠিক ভাতের মতই বরং পুষ্টিগুন ভাতের চেয়ে অনেক বেশী। ঢেমশি খেলে নিম্ন উপকারসমূহ পাওয়া যাবে -

১। কম পরিমাণ শর্করা এবং অধিক পরিমাণ ফাইবার থাকায় রক্তে সুগারের পরিমান (ডায়াবেটিস) নিয়ন্ত্রণ করে। হৃদরোগী এবং ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য একমাত্র আদর্শ এবং নিরাপদ খাদ্য।
২। প্রাকৃতিকভাবেই অধিক পরিমাণ আমিষ, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, জিংক প্রভৃতি থাকায় শিশুর ওজন, উচ্চতা, মেধাশক্তি, পেশী শক্তি, হিমোগ্লোবিন লেভেল বৃদ্ধি করে এবং হাঁড় মজবুত করে।
৩। অধিক পরিমান আমিষ থাকায় গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারী মায়ের জন্য অতি জরুরী (শিশু প্রচুর দুধ পাবে)
৪। অধিক পরিমাণ ফাইবার থাকায় কোষ্ট-কাঠিন্য দূর করে এবং মন ও দেহ সুন্দর থাকে।
৫। হাঁড়ের ক্ষয়রোধ করে, মজবুত করে এবং হাঁড়ের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন করে বলেই শরীরে কোন ব্যাথা থাকেনা।
৬। বিভিন্ন প্রকার ক্যান্সার প্রতিরোধ এবং নিরাময়ে সহায়তা করে।

উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে দামী মধু এই ঢেমশির ফুল থেকেই উৎপাদন হয়।

ঢেমশি চাল, আটা, মধূ এবং অন্যান্য খাদ্যপণ্য রপ্তানি করে বছরে শত শত কোটি টাকার বৈদেশিক মূদ্রা অর্জন করা সম্ভব। অপরদিকে, ঢেমশি চাষের মাধ্যমে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা এবং নিরাপদ খাদ্য প্রতিষ্ঠা পাবে অতি সহজে। মাটি, জনস্বাস্থ্য, পরিবেশের উন্নয়ন এবং জীব-বৈচিত্র ফিরে আনা যাবে খুব সহজেই যদি আমরা আবার সেই সবচেয়ে অবহেলিত ফসল "ঢেমশি" চাষ শুরু করি।

বিদেশী ফল ভক্ষণ আহাম্মকিপনা ছাড়া আর কিছুই নয় !!

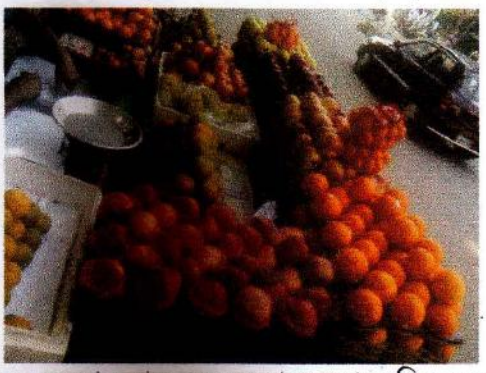

দেখে মনে হয় এ দেশে কোন ফল হয়না যেহেতু ছবির সব ফলই বিদেশী

"নিজের পাঁয়ে কুড়াল মারা" এবং "খাল কেটে কুমির আনা" বাক্যসমূহের বাস্তব প্রয়োগ হলো বিদেশী ফল ভক্ষণ করা। আমাদের ভাই-বোনগণ বাড়ি-ভিটা বেচে, বাপ-মা, বৌ-বাচ্চা ফেলে, অমানুষিক পরিশ্রম করে, মাথার ঘাম মাটিতে ফেলে, শরীরের রক্ত ঝরিয়ে দেশে ডলার পাঠাচ্ছেন। আর আমরা আহাম্মক সাহেবরা ঐ ডলার দিয়ে বিষ মেশানো বিদেশী ফল আমদানি করছি আর ভক্ষণ করছি।

প্রিজারভেটিভ নামের বিষ মেশানো এ সব ফল খেয়েই দেশে প্রতি বছর নিষ্পাপ শিশুসহ প্রায় ২ লাখ মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ হৃদরোগ, লিভাররোগ, কিডনীরোগ, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত। দেশের প্রত্যেক মানুষের দেহের রক্ত বিষাক্ত হয়ে গেছে (যেহেতু রক্তে বিষের পরিমান ০.২ মা:গ্রামের পরিবর্তে ৯.৭ মা:গ্রাম পাওয়া গেছে)। প্রতিদিন হাসপাতাল, ক্লিনিকের সংখ্যা বাড়ছে। চিকিৎসাবাবদ সরকার এবং জনগণের কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে।

নীতি নির্ধারকগণই বিদেশী ফল বেশী খান এর প্রমাণ বাংলাদেশ সচিবালয়ের তিন পাশে শত শত ফলের দোকান। একটি উদাহরণ এই যে, গত বছর আমার প্রতিষ্ঠানের নামে ইস্যুকৃত একটি চিঠি আনতে সচিবালয়ের পশ্চিম গেইটে গেলাম, এক কেরানী মহাশয় ৫০০ টাকা নেয়ার পরই কেবল চিঠিখানা আমার হাতে দিলেন। মুহূর্তের মধ্যেই ঐ টাকা দিয়ে আমার সামনেই তিনি আপেল, আঙ্গুর আর কমলা কিনলেন। আরও একটি লজ্যাস্কর এবং আহাম্মকিপনার উজ্বল প্রমাণ এই যে, সরকারী, বেসরকারী, এনজিও প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মিটিং বা সভায় যে নাস্ত্মা দেয়া হয় সেখানে অবশ্যই বিদেশী ফল থাকে।

কাঁঠাল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং পুষ্টিকর ফল, যার জন্ম এই ছোট্ট দেশে। আমাদের সকল ফলই ঔষধীগুণসম্পন্ন, পুষ্টিকর, মজাদার, উপকারী এবং স্বাস্থকর। ফলের দেশ বাংলাদেশ ! পৃথিবীর এমন কোন দেশ নাই যেখানে এত প্রকারের, এত পুষ্টিমানের এবং এত উপকারী ফল জন্মে।

আমাদের দেশের অনেক ফলের মাঝে অবহেলিত ২টি ফলের সাথে বিদেশী ফলের পুষ্টিমানের বিশাল পার্থক্য নিম্নে দেখানো হলো -

ফলের নাম	খনিজ পদার্থ(গ্রাম)	আঁশ (গ্রাম)	লৌহ (গ্রাম)	বিটা-ক্যারোটিন (মাইক্রো গ্রাম)	ভিটামিন সি (মিলি গ্রাম)
আপেল	০.৩	১.০	১.০	নাই	৪
কমলা	০.১	০.৩	০.৩	নাই	৪০
আঙ্গুর	০.৫	২.৯	০.৫	নাই	২৯
পেয়ারা	**০.৭**	**৫.২**	**১.৪**	**১০০**	**২১০**
কামরাঙা	**০.৪**	**১.০**	**১.২**	**অল্প**	**৬১**

অথচ, অবহেলিত এ ফল ২টির দাম প্রতি কেজি সর্বোচ্চ ৪০ টাকা। আমড়া, জাম. জলপাই, বেল, আমলকি, তেতুল, বহেরা, হরতকি, কদবেল, জামরুল, ডাউয়া, লটকনসহ আরও কতইনা ফল আছে এ দেশে।

আতপ চাল নিরাপদ, অভ্যাস করলেই বছরে ১২ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয়

আমাদের দেশে একেবারেই বিনা কারণে ধান সিদ্ধ করা হয়, যেমন -

১। ধান সিদ্ধ করার আগে ১০/১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হয় এতে শ্রম এবং পানি অপচয় হয়
২। ধান সিদ্ধ করতে শ্রম এবং বিপুল পরিমান জ্বালানী (২৫ কেজি/মন) অপচয় হয়
৩। ধান সিদ্ধ করতে অনেক ধান ফেটে যায় এবং ফাটা অংশে মাটি, ধুলা-বালি, মল-মূত্র ঢুকে
৪। সিদ্ধ ধান শুকাতে বিপুল পরিমান বিদ্যুৎ অপচয় হয়
৫। ১ কেজি সিদ্ধ চালে ৬ টাকা এবং বছরে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা অপচয়
৬। সিদ্ধ ধানের চালের ভাত রান্না করতে পানি, জ্বালানী এবং সময় বেশী লাগে
৭। সিদ্ধ চালের ভাতে পুষ্টিমান কম, যেমন -

সিদ্ধ চালের পুষ্টিমান (১০০ গ্রামে) ঃ-

খনিজ গ্রাম	আঁশ গ্রাম	খাদ্যশক্তি কি: ক্যাল	আমিষ গ্রাম	চর্বি গ্রাম	শর্করা গ্রাম	ক্যালসিয়াম মি:গ্রাম	লৌহ মি:গ্রাম	ভি:বি-১ মি:গ্রাম	ভি:বি-২ মি:গ্রাম
০.৯	-	৩৪৯	৬.৪	০.৪	৭৯.০	৯.০	২.৮	০.২১	০.০৫

আতপ চালের পুষ্টিমান (১০০ গ্রামে) ঃ-

খনিজ গ্রাম	আঁশ গ্রাম	খাদ্যশক্তি কি: ক্যাল	আমিষ গ্রাম	চর্বি গ্রাম	শর্করা গ্রাম	ক্যালসিয়াম মি:গ্রাম	লৌহ মি:গ্রাম	ভি:বি-১ মি:গ্রাম	ভি:বি-২ মি:গ্রাম
০.৯	০.৬	৩৪৬	৭.৫	১.০	৭৬.৭	১০.০	৩.২	০.২১	০.১৬

কোন দেশের মানুষই সিদ্ধ চালের ভাত খাননা। একেবারেই অপ্রয়োজনীয় ধান সিদ্ধ প্রথাটি বন্ধ করা অতি জরুরী। কারণ এতে লাখ লাখ টন জ্বালানী এবং অসংখ্য শ্রম অপচয় হয়। অপরদিকে চালে বিভিন্ন প্রকার ঐধুধৎফ / ঝুকি চলে আসে এবং পুষ্টিমান কমে যায়। নিরর্থক এ কাজে বন উজার হচ্ছে এবং কার্বন ডাই অক্সাইডসহ বিভিন্ন প্রকার বিষাক্ত গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে পরিবেশ দুষিত হচ্ছে এবং মানুষের রোগব্যাধী বাড়ছে। অথচ আতপ চালের পুষ্টিমান বেশি, উৎপাদন খরচ কম এবং এর কুঁড়া থেকে প্রয়োজনীয় নিরাপদ ভোজ্যতেল (ব্রান অয়েল) উৎপাদন করা যায়।

আতপ চাল আন্তরিকভাবে গ্রহণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার হবে এবং নিরাপদ খাদ্য প্রতিষ্ঠা পাবে। দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে আজ থেকেই সিদ্ধ চাল বর্জন এবং আতপ চাল গ্রহণের অঙ্গীকার জরুরী।

মাটি ও মানুষ বাঁচাতে - সয়াবীন / সয়াখাদ্য

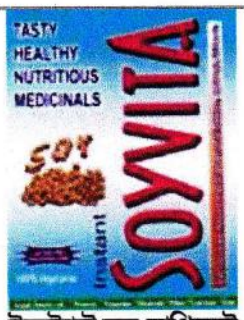

ইনস্ট্যান্ট ফুড সাপ্লিমেন্ট

সয়ামাংস

সয়াদুধ

খাদ্যমান, পুষ্টিমান এবং উপকারীর দিক থেকে সয়াবীন ফসলটির স্থান সব ফসলের উপরে। সয়াবীন খাদ্য হিসেবে মানুষের পক্ষে খুবই পুষ্টিকর এবং সহজপাচ্য অথচ দামে সস্তা। এতে প্রায় ৪৬% প্রোটিন, ২০% কার্বোহাইড্রেট, ১৮% তেল, ৫% খনিজ পদার্থ, ৯% আশ আছে। বাংলাদেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর আমিষের ঘাটতি পূরণে সয়া খাদ্যের ব্যাপক প্রসার বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। অপর দিকে এ ফসলটি তেল সমৃদ্ধ হওয়ায় ক্যালরীর ঘাটতি পূরণেও সক্ষম।

সয়াবীন শুধু মানুষ বা প্রাণীর স্বাস্থ্যই রক্ষা করেনা মাটির স্বাস্থ্যও রক্ষা করে। এই ফসলটি নিজে নিজে বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে এবং মাটিতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে এবং পর পর ৩ বার চাষ করলে ঐ জমিতে আর কোন সার লাগেনা। তবে আশ্চর্যের বিষয় যে, এই অমূল্য ফসটি আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই দেখেনি। অথচ প্রতিদিনই "সয়াবীন" নামক শব্দটি কমপক্ষে ৪/৫ বার উচ্চারণ করে। এম.সি.সি নামক একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান বহু বছর সয়াবীনকে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করেছিল তবে সফল হতে পারেনি যার পিছনে রয়েছে অনেক কারণ।

১৬ কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশ। এ দেশে যদি প্রতিটি উপজেলায় ১টি করে সয়াখাদ্যের কারখানা গড়ে উঠে তাহলেও কোন সমস্যা নেই। মানুষ প্রতিদিন যেসব খাবার খায় তার প্রায় সবগুলিই সয়াবীন থেকে তৈরী করা সম্ভব। সয়াবীন হতে নিম্নলিখিত খাদ্যগুলি তৈরী করা যায়:-

১) সয়া দুধঃ যা পুষ্টিগুনে ও মানে হুবহু প্রাণীজ দুধের মতই। গরুর দুধে ৩.৭% প্রেটিন, ৩.৭% ক্ষতিকারক চর্বি, ও ৪.৮% কার্বোহাইড্রেট আছে। আর সয়া দুধে আছে ৩.৫% প্রোটিন, ২.৮% উপকারী চর্বি ৩.১% কার্বোহাইড্রেট। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এখন সয়াদুধ ব্যাপকভাবে চলছে। অমাদের দেশেও দিন দিন এ দুধের চাহিদা বাড়ছে তবে সাধারণ লোকদের মধ্যে নয়, শহরের উচু শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিলাস দ্রব্য বা পানীয় হিসেবে। আমাদের দেশে এক শ্রেণীর বিবেক বুদ্ধিহীন ব্যবসায়ী এই অতি সহজ প্রাপ্য দ্রব্যটি লক্ষ লক্ষ ডলার দিয়ে আমদানী করছে। উৎপাদন ব্যয়সহ ১ লিটার সয়াদুধ ১০ টাকায় বিক্রি করা সম্ভব। এই দুধে ক্ষতিকারক চর্বি এবং ল্যাকটোজ না থাকায় রোগীসহ সবাই খেতে পারবে এবং উৎকৃষ্ট শিশুখাদ্য। বিশ্বের সকল দেশের চিকিৎসকগন মহিলা, শিশু ও রোগীসহ সবাইকে সয়াদুধ খাওয়ানোর পরামর্শ দিয়ে থাকেন অথচ আমাদের দেশে নিরুৎসাহিত করা হয় কারণ এ বিষয়ে তারা অজ্ঞ।

২) সয়া মাংসঃ সয়া মাংস পুষ্টিগুনে যে কোন মাংসের চেয়ে প্রায় ৩ গুন (৬০% আমিষ) এবং পরিমানে ১ কেজি সয়ামাংস ৮ কেজি পশু মাংসের সমান। চিকিৎসকরা যাদেরকে এবং যে সব রোগীকে লাল মাংস খেতে নিষেধ করেছেন তারাও নিশ্চিন্তে সয়া মাংস খেতে পারেন। এছাড়া আমাদের দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে অনেকে নিরামিষভোজী আছেন তারাও এই সয়া মাংস খোঁজেন। উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশের অনেক নিরামিষভূজিই ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং বিভিন্নভাবে ভারত থেকে এই সয়া মাংস অনেক আগে থেকেই নিয়ে আসছেন।

৩) সয়াবীন তেলঃ আমরা সয়াবীন তেল নামক যে দ্রব্যটি পাই বা খাই তা আসলেই সয়াবীন তেল নয়। এই তেলের পিওরিটি সর্বোচ্চ ২০%। বিবেকহীন উৎপাদনকারী এবং ব্যবসায়ীরা অতি প্রয়োজনীয় এই পণ্যটি দীর্ঘ দিন যাবৎ ভেজাল করে আসছে। আর এই ভেজাল তেল খাবার কারনেই বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ অনেক বড় বড় কঠিন এবং জটিল রোগে আক্রান্ত। সয়াবীন তেলের রহস্য অনেক ব্যাপক। আমরা যদি সয়াবীন থেকে তেল উৎপাদন করি তাহলে ১০০ - ১২০ টাকায় প্রতি লিটার খাটি সয়াবীন তেল পেতে পারি।

৪) সয়া তফু/পনির/ছানা/মিষ্টি:- সয়া দুধ থেকে তফু/পনির/ছানা/মিষ্টি খুব সহজেই তৈরী করা যায়। মোট কথা গরু বা মহিষের দুধ থেকে যে সব খাদ্য তৈরী হয় সয়া দুধ থেকেও তা হবে। এছাড়াও সয়াবীন থেকে সয়া সস/আটা/ময়দা/লাড্ডু/কাটলেট/চানাচুর/হালুয়া/বার্গার/বড়া/পিয়াজুসহ অনেক মুখরোচক ও পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন করা যায়।

বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলেই সয়াবীন চাষ করা সম্ভব। তবে বৃহত্তর নোয়াখালী, বরিশাল, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর এবং রংপুর জেলার মাটি সয়াবীন চাষের জন্য খুবই উপযোগী। এসব অঞ্চলে প্রতি বিঘা জমিতে ৮-১০ মন সয়াবীন উৎপাদ করা সম্ভব।

আমি দেশের বিভিন্ন জেলায় ২০০২ সাল থেকে সয়াবীন চাষ করছি এবং সয়াবীন হতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য উৎপাদন করছি এবং পরিচিত করাচ্ছি। আমি বৈজ্ঞানিকভাবে শতভাগ নিশ্চিত যে সয়াবীন চাষের উন্নয়ন এবং প্রায় ২০ প্রকারের সয়া খাদ্য উৎপাদন এবং গ্রহণের মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই বাংলাদেশের মানুষকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অপুষ্টি এবং রোগব্যধি হতে মুক্ত রাখতে পারি।

বাংলাদেশে প্রায় ১০ লাখ হেক্টর অনাবাদী, অনুর্বর এবং পতিত জমি আছে। এ বিশাল পরিমান জমিকে আমরা খুব সহজেই সয়াবীন চাষের আওতায় এনে ১২ থেকে ১৫ লাখ টন সয়াবীন উৎপাদন করতে পারি, যা থেকে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা আয় করা সম্ভব।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে তামাকের পরিবর্তে সয়াবীন চাষ করে আমরা খাদ্য নিরাপত্তা খুব সহজেই জোরদার করতে পারি। তামাক নি:সন্দেহে রাক্ষুসী ফসল যা মাটি ও মানুষকে ধ্বংস করে। অপরদিকে একমাত্র সয়াবীনই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি প্রোটিন সমৃদ্ধ ফসল যা মাটি থেকে খায় না বরং মাটিকে খাওয়ায় এবং দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অপুষ্টি এবং রোগব্যধি দূর করতে একমাত্র অবলম্বন।

সয়াবীনের অসংখ্য গুনাবলীর কয়েকটি নিম্নে দেয়া হলো -

১। সয়াবীনে ক্যান্সারবিরোধী ৫ উপাদান (১) ইনোসিটল হেক্সাফসফেট (২) আইসোফ্লাভোনস (৩) প্লান্ট স্টেরলস (৪) প্রোটিজ ইনহিবিটরস (৫) স্যাপোনিনস আছে।

২। সয়াবীনে সল্যুবল ফাইবার থাকায় রক্তে সুগারের পারমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

৩। একমাত্র সয়াখাদ্যই শিশুদের ওজন, উচ্চতা, মেধাশক্তি, পেশী শক্তি, রক্তে হেমোগ্লোবিন লেভেল বৃদ্ধি করে এবং হাঁড় মজবুত করে অন্য কোন খাদ্য নয়।

৪। এফডিএ 'র মতে দৈনিক ৬০ গ্রাম সয়াবীন খেলে হৃদরোগের সম্ভাবনা নাই।

৫। গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারী মায়ের জন্য সয়াখাদ্য অতি জরুরী (শিশু অফুরন্ত মায়ের দুধ পাবে)

৬। নারী পুরুষের যৌনাকাংখা বৃদ্ধি করে এবং উভয়ের বন্ধাত্ব দূরে সহায়তা করে।

৭। সয়াখাদ্য খেলে শিশুকে জিংক ট্যাবলেট খাওয়ানোর কোনই প্রয়োজন নাই।

৮। সয়াবীনে প্রচুর ফাইবার থাকায় কোষ্ট-কাঠিন্য দূর হয়।

৯। কেবলমাত্র সয়াবীন খেলেই খুসকি দূর হবে, চুল গজাবে এবং চুল পড়া ও পাকা কমাবে।

অলস সময়!!!!!

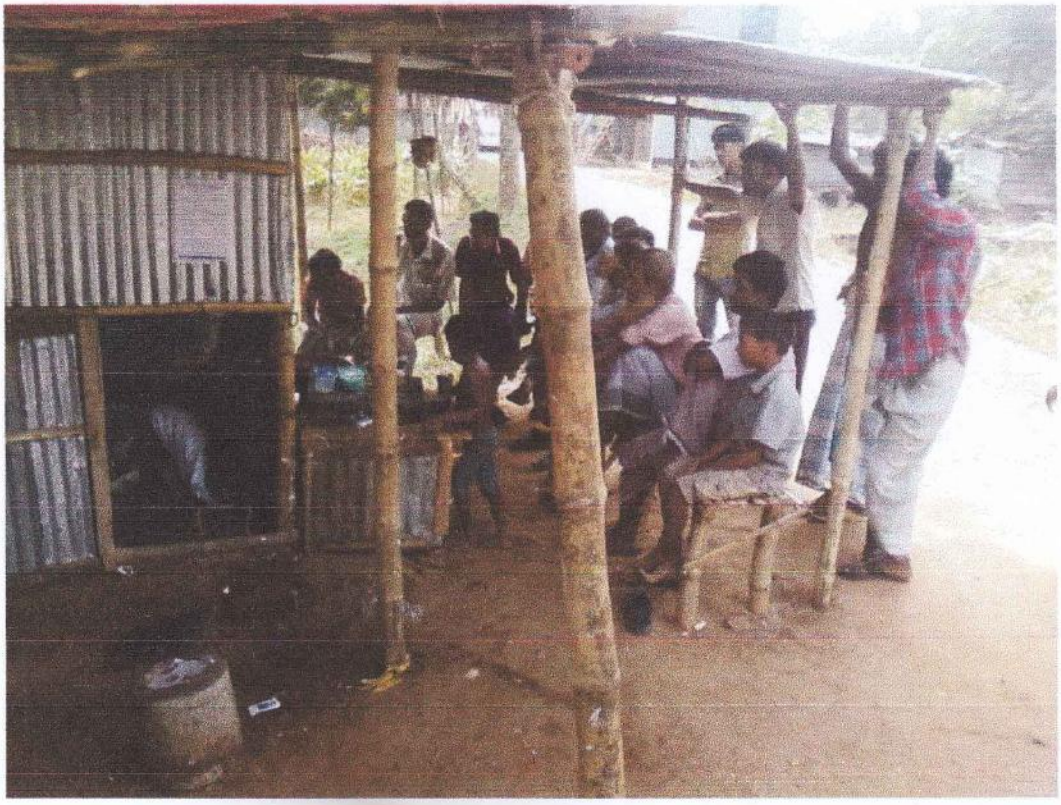

ক্ষতিকারক রাসায়নিক সার ও কীটনাষকমুক্ত সব্জির আশায় সাভারের একটি গ্রামের একখন্ড জমিতে সব্জি আবাদ করছি। ঐ জমিতে সপ্তাহে একদিন যেতে হয়। যাওয়া আসার পথে অনেক ছোট ছোট দোকান পরে। প্রত্যেকটি দোকানের দৃশ্য উপরের ছবিটির মত।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে, ছোট্ট দোকানটির সামনে বসে প্রায় ২০ জন মানুষ টেলিভিশন দেখছেন। দর্শকগণ বসে বসে শুধু কিছুক্ষণ পর পর চা, পান আর সিগারেট ফুকাচ্ছেন। অথচ তারা জমিতে কাজ করলে মাটি উর্বর হতো, ফসল ফলতো, আর্থিক সচ্ছলতা আসত এবং শরীর ও মন ভাল থাকত।

কৃষি ব্যবসার কারণে সারাদেশে ঘুরতে হয়। গ্রামের বিভিন্ন রাস্তার মোরে যেখানে কোন দোকান ছিল না সেখানে এখন ৫/৭টি দোকান হয়েছে। প্রত্যেকাট দোকানে বড়দের জন্য চা, পান, সিগারেট আর ছোটদের জন্য বিষাক্ত রং মিশ্রিত বিভিন্নপ্রকার কুখাদ্য পাওয়া যায়। এ কারণেই শহরের মত গ্রামের জনস্বাস্থ্যও এখন হুমকির মুখে।

এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, সিঙ্গাপুরে তিনজন তো দূরের কথা দুইজন লোককে কোথাও আড্ডা দিতে দেখলে পুলিশকে উপযুক্ত কৈফিয়ত অথবা জরিমানা গুনতে হয় অথবা শাস্তি পেতে হয়।

আমরা কি আমাদের উন্নয়নের জন্য, ভালোর জন্য, ভালো থাকার জন্য সিঙ্গাপুরের মত হতে বা করতে পারিনা ??? দেশ ও জাতির উন্নয়ন এবং কল্যাণে গ্রামের সকল অপ্রয়োজনীয় দোকান বন্ধ / নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারকে জরুরী পদক্ষেপ নিতে হবে।

মুহাম্মদ আব্দুস ছালাম
সভাপতি
বাংলাদেশ অর্গানিক প্রোডাক্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন
০১৭৩৪-৫৫১৫২৬